হাদিসের আলোকে

বিভিন্ন নামাজের ফজিলত

(ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব, এশা, তাহাজ্জুদ,
ইশরাক, তাহিয়্যাতুল ওযুর নামায)

সংকলনে

Shopnochare.blogspot.com

সূচিপত্র

নামায	পৃষ্ঠা
ফজর	2
যোহর	12
আসর	15
মাগরিব	19
এশা	21
তাহাজ্জুদ	23
ইশরাক	34
তাহিয়্যাতুল ওজু	37

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

সালাত, কালেমা শাহাদতের স্বীকৃতির পরই ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। আর সালাতে অলসতাকারীদের মধ্যে শ্রেণিভেদ রয়েছে। সালাত হলো ইসলামের বৃহত্তম নিদর্শন ও প্রতীক।

পবিত্র কুরআনের আলোকে বার বার সালাত বা নামায কায়েমের কথা বলা হয়েছে। স্ত্রী-সন্তান সন্ততিদের সালাত কায়েমের নির্দেশ দিতে হবে, অমনোযোগী নামায সালাত আদায়কারীর ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালার সতর্কবার্তা, নিজেদের খেয়াল খুশিমতো নামায আদায়কারীরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত, পবিত্র হাদীসের আলোকে সালাত বা নামাযের ফজিলত ও গুরুত্ব, গুরুতর ওজর ব্যতিত জুমার নামায ও জামায়াতে শরীক না হওয়া মুনাফিকের আলামত।

তাই আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটিতে ভিন্ন ভিন্ন সালাতের ভিন্ন ভিন্ন ফজিলত এবং বৈজ্ঞানিক উপকারিতা (তবে, সলাত আদায়ের ক্ষেত্রে আমাদের নিয়ত হবে অবশ্যই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন) বর্ণনার চেষ্টা করেছি, যাতে এসব ফজিলতের বয়ান শুনে আমরা সহজেই সালাত আদায়ে উদ্বুদ্ধ হতে পারি। আল্লাহ সুবহানুওয়াতালা আমিসহ আমাদের সকল মুসলিম ভাই-বোনদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সঠিক সময়ে, সঠিক নিয়মে, খুশু-খুযূর সাথে ইখলাসের সাথে আদায় করার তাওফিক দান করুন, আমিন।

ফজর

প্রতিটি মুসলিমের সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ঈমান। এরপরেই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ। ঈমানের পর নামাজের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মধ্যে এশা ও ফজরের জামাআতের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি।

আল্লাহপাক কুরআনুল কারীমে বলেন, “নামাজ কায়েম করো সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত এবং কায়েম করো ফজরের নামাজ। নিশ্চয়ই ফজরের নামাজ উপস্থিতির সময়।” (সূরা বনী ইসরাঈল, ৭৮)

তাফসির

আলোচ্য আয়াতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়সূচির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তবে এখানে আলাদাভাবে ফজরের নামাজের কথা বলা হয়েছে। আয়াতে নামাজ বোঝানোর জন্য ‘কোরআন’ শব্দ আনা হয়েছে। এর পাশাপাশি ‘ফজর’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ‘কোরআন’ অর্থ পড়া বা পাঠ করা। আর ‘ফজর’ শব্দের অর্থ ভোর হওয়া বা প্রভাতের উদয় হওয়া। আয়াতে এই দুটি শব্দ সম্বন্ধযুক্ত করে একসঙ্গে আনা হয়েছে। তাই শব্দ দুটির অর্থ হলো– ফজরের কোরআন পাঠ।

নামাজ বোঝানোর জন্য ‘কোরআন’ শব্দ আনার কারণ হলো, কোরআন পাঠ নামাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আয়াতে সেদিকেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। বিশেষত ফজরের নামাজের সঙ্গে কোরআনের নিবিড় সম্পর্ক

আছে। কেননা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মধ্যে ফজরের নামাজে সর্বাধিক দীর্ঘ কিরাত পাঠ করতে হয়। ফজরের দুই রাকাত ফরজ নামাজ জামাতে পড়ার সময় সূরা-কিরাত সশব্দে পড়া ওয়াজিব। ফজরের নামাজের সুন্নত কিরাত হলো, তিওয়ালে মুফাসসল অর্থাৎ ফজরের ফরজ নামাজের প্রতি রাকাতে সূরা হুজুরাত থেকে সূরা বুরুজ পর্যন্ত সূরা বা এর সমপরিমাণ আয়াতবিশিষ্ট সূরা পাঠ করা সুন্নত।

নামাজের মধ্যে যেমন ফজরের রয়েছে বিশেষ গুরুত্ব, তেমনি সময়ের মধ্যে ফজরের সময়ের রয়েছে বিশেষ গুরুত্ব। পবিত্র কোরআনে ‘ফজর’ নামে একটি সূরাও রয়েছে। ওই সূরার শুরুতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, ‘শপথ ফজরের।’ (সূরা ফজর, ১)

হাদিসেও ফজরের নামাজের বিশেষ তাগিদ রয়েছে যা পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে ফজরের জন্য একটি গুণবাচক শব্দ আনা হয়েছে। সেটি হলো ‘মাশহুদ’। এর অর্থ উপস্থিত হওয়া। হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী, এ সময় দিন-রাতের উভয় দল ফেরেশতা দুনিয়ায় মিলিত হয়। তাই একে ‘মাশহুদ’ বলা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, ‘রাতের ফেরেশতা ও দিনের ফেরেশতারা ফজরের সময় উপস্থিত হয়।’ (তিরমিজি, ৩১৩৫)

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, ‘জামাতের নামাজের ফজিলত একাকী নামাজের চেয়ে ২৫ গুণ বেশি। রাতের ফেরেশতা ও

দিনের ফেরেশতারা ফজরের নামাজে একত্র হয়ে থাকে।' (বুখারি, ৬৪৮; মুসলিম, ৬৪৯)

কাজেই ফজরের সালাত জামাতের সঙ্গে আদায় করার যথেষ্ঠ গুরুত্ব রয়েছে। আর এ সালাত দেরী করে ফর্সার মধ্যে আদায় করার চেয়ে অন্ধকারে অর্থাৎ- আউয়াল ওয়াক্তে আদায় করাই উত্তম।

আবূ হুরাইরাহ ﵁ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের নিকট দিবারাত্রি ফেরেশতাবর্গ পালাক্রমে যাতায়াত করতে থাকেন। আর ফজর ও আসরের সালাতে তারা একত্রিত হন। তারপর যারা তোমাদের নিকট রাত কাটিয়েছেন, তারা ঊর্ধ্ব আকাশে চলে যান। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাদের জিজ্ঞেস করেন অথচ তিনি তাদের সম্পর্কে ভালোভাবে পরিজ্ঞাত, 'তোমরা আমার বান্দাদের কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছ?' তারা বলেন, আমরা যখন ছেড়ে এসেছি, তখন তারা সালাতে প্রবৃত্ত ছিলো। আর যখন আমরা তাদের নিকট গিয়েছিলাম, তখনও তারা সালাতে প্রবৃত্ত ছিল।" (সহিহ বুখারি, ৩২২৩; সহিহ মুসলিম, ৬৩২/২১০)

এশা ও ফজর– এ দুই সময়ে মানুষ সাধারণত পরিবারের সঙ্গে সময় কাটায় ও বিশ্রাম করে। ফলে জামাত দুটিতে যথেষ্ট অবহেলা ও গাফিলতি হয়ে থাকে। এজন্য হাদিসে এর প্রতি বিশেষভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।

উবাই ইবনে কাব ﵁ থেকে বর্ণিত, একবার রাসূল ﷺ আমাদের ফজরের নামাজ পড়িয়েছেন। সালাম ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন, ‘অমুক কি আছে?’ লোকেরা বলল, নেই। তারপর আরেকজনের নাম নিয়ে জিজ্ঞেস করেন, ‘অমুক কি আছে?’ লোকেরা বলল, নেই। তিনি বললেন, ‘এ দুই নামাজ (এশা ও ফজর) মুনাফিকদের জন্য সবচেয়ে কঠিন। তোমরা যদি জানতে যে এই দুই নামাজে কী পরিমাণ সওয়াব নিহিত রয়েছে, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে আসতে।’ (আবু দাউদ, ৫৫৪)

ফজরের দুই রাকাত সুন্নত নামাযের গুরুত্ব

সুন্নত নামাজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। হাদিসে এর প্রভূত ফজিলত বর্ণিত হয়েছে, যা অন্য সুন্নতের ক্ষেত্রে হয়নি।

এক হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, ‘ফজরের দুই রাকাত (সুন্নত) দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম।’ (মুসলিম, ৭২৫)

আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত হাদিসে মহানবী ﷺ বলেছেন, ‘শত্রুবাহিনী তোমাদের তাড়া করলেও তোমরা এই দুই রাকাত কখনো ত্যাগ করো না।’ (আবু দাউদ, ১২৫৮)

ফজর নামাজের সুন্নত কেন গুরুত্বপূর্ণ

ফজরে কেবল দুই রাকাত নামাজ ফরজ। কিন্তু এই দুই রাকাত নামাজের মর্যাদা ও গুরুত্ব অন্য সব নামাজের তুলনায় বেশি। কারণ, ফজরের সময়টাতে সব মানুষ ঘুমে বিভোর থাকে। যিনি ফজর নামাজ আদায় করেন, তিনি প্রশান্তির ঘুম ও নরম বিছানা ত্যাগ করে বড় পরাকাষ্ঠা স্থাপন করেন। মহান আল্লাহর অনুকম্পা, ক্ষমা-মার্জনা ও জান্নাত লাভের আশায় সাত-সকালে উঠে পড়েন। এই কারণে ফজরের নামাজ আদায়কে ঈমান ও নিফাকের পার্থক্য-রেখা নির্ণয় করা হয়েছে।

আর ফজরের সুন্নত সর্বাধিক গুরুত্ববহ সুন্নত। রাসুল ﷺ ঘরে-সফরে সবসময় এটি পড়তেন। ফজরের ফরজের আগে দুই রাকাত নামাজ হলো– ফজরের আজানের পর সংক্ষিপ্ত দুই রাকাত নামাজ। এই দুই রাকাত ফজরের ফরজ আদায়ের আগে পড়তে হয়। (মাউসুআতুল ফিকহিল ইসলামি, খণ্ড ০২, পৃষ্ঠা ৫৯৭)

উম্মুল মুমিনিন হাফসা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত আছে, মুআজ্জিন ফজরের আজান শেষ করলে ও ফজর উদিত হলে, রাসুল ﷺ ফজরের নামাজের আগে দুই রাকাত সংক্ষিপ্ত সুন্নত পড়তেন। (বুখারি, ৬০১)

উম্মুল মুমিনিন আয়েশা رضي الله عنها বর্ণনা করেন, রাসুল ﷺ ফজরের দুই রাকাত সুন্নতের মতো অন্য কোনো নফলের প্রতি অতটা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন না।’ (বুখারি, ১১৬৩)

আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল ﷺ বলেন, ‘তোমাদের যদি ঘোড়া রেখে চলেও যায়, তবু ফজরের দুই রাকাত সুন্নত ত্যাগ করো না।’ (আবু দাউদ, ১২৫৮)

রাসুল ﷺ সফরে-ঘরে কোথাও ফজরের সুন্নত ত্যাগ করতেন না কিংবা না পড়ে থাকতেন না। ফজরের সুন্নতের সওয়াব ও প্রতিদানও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

উম্মুল মুমিনিন আয়েশা ﵂ থেকে বর্ণিত, হাদিসে রাসুল ﷺ বলেন, ‘ফজরের দুই রাকাত সুন্নত দুনিয়া ও দুনিয়ার মাঝে যা কিছু রয়েছে, তা থেকে উত্তম।’ (মুসলিম, ৭২৫)

ফজর নামাযের ফজিলত

➲ ফজরের নামাজে দাঁড়ানো, সারা রাত দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সমান

উসমান ইবন আফফান ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি জামাতের সাথে ঈশার নামাজ আদায় করলো, সে যেন অর্ধেক রাত জেগে নামাজ পড়লো। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সাথে পড়লো, সে যেন পুরো রাত জেগে নামাজ পড়লো।’ (মুসলিম, ১০৯৬)

➲ ঐ দিনের পুরোটা আল্লাহর জিম্মায় থাকার দুর্লভ সৌভাগ্য

যুনদব ইবন আব্দুল্লাহ ﵁ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ আদায় করল, সে আল্লাহর জিম্মায় চলে গেল। অতএব

আল্লাহ যেন তার জিম্মার বিষয়ে তোমাদেরকে কোনোরূপ অভিযুক্ত না করেন।’ (তিরমিযি, ২১৮৪)। ফজরের নামাজ পড়লেই শুধু এ-ঈর্ষণীয় সৌভাগ্য লাভ করা যাবে।

➲ ফজরের নামাজ কেয়ামতের দিন নূর হয়ে দেখা দেবে

বুরাইদা আলআসলামি ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘যারা আঁধারে (ফজর নামাযে) মসজিদের দিকে হেঁটে যায়, তাদের কেয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূর প্রাপ্তির সুসংবাদ দাও।’ (আবু দাউদ, ৪৯৪)

➲ জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাত প্রাপ্তির সুসংবাদ

আবূ যুহাইর ‘উমারাহ ইবনে রুআইবাহ ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, ‘যে ব্যক্তি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে (অর্থাৎ ফজরের ও আসরের নামাজ) আদায় করবে, সে কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।’ (মুসলিম, ৬৩৪; নাসায়ি, ৪৭১, ৪৮৭; আবু দাউদ, ৪২৭; আহমদ, ১৬৭৬৯, ১৭৮৩৩)

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন, ‘যে ব্যক্তি দুটি শীতল সময়ে সালাত আদায় করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।’ (সহিহ বুখারি, ৫৭৪; সহিহ মুসলিম, ৬৩৫/২১৫)

আর এটা স্বতঃসিদ্ধ যে ফজরের নামাজ রাতের সবচেয়ে শীতল অংশে এবং আসরের নামাজ মৃদুমন্দ ঠাণ্ডা পড়ার পর দিনের সবচেয়ে শীতল অংশে আদায় করা হয়।

➲ মুনাফিকী থেকে মুক্তি পাবে

আবূ হুরাইরা ﵁ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘মুনাফিকদের উপর ফজর ও এশার নামাজ অপেক্ষা অধিক ভারী নামাজ আর নেই। যদি তারা এর ফজিলত ও গুরুত্ব জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে বা পাছার ভরে অবশ্যই (মসজিদে) উপস্থিত হত।’ (বুখারি ৬৫৭, ৬৪৪, ৬৫৭, ২৪২০, ৭২২৪; মুসলিম ৬৫১)

➲ সরাসরি আল্লাহর দরবারে নিজের নাম আলোচিত হবে

আবূ হুরাইরা ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘তোমাদের কাছে পালাক্রমে দিনে ও রাতে ফেরেশতারা আসে। তারা আসর ও ফজরের সময় একত্রিত হয়। যারা রাতের কর্তব্যে ছিল তারা ওপরে উঠে যায়। আল্লাহতো সব জানেন, তবুও ফিরিশতাদেরকে প্রশ্ন করেন, “আমার বান্দাদেরকে কেমন রেখে এলে?” ফেরেশতারা বলে, আমরা তাদেরকে নামাজরত রেখে এসেছি। যখন গিয়েছিলাম, তখনো তারা নামাজরত ছিল। (বুখারি, ৫৪০)

➲ দুনিয়া ও আখিরাতের সেরা বস্তু অর্জিত হয়ে যাবে

আয়েশা ﵂ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘ফজরের দুই রাকাত দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, সবকিছুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ।’ (মুসলিম, ১২৪০)

➲ পরিপূর্ণ এক হজ্জ ও ওমরার সওয়াব পাবে, যদি সে সূর্য ওঠা পর্যন্ত আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকে

আনাস ইবন মালিক ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি জামাতের সাথে ফজরের নামাজ আদায়ান্তে বসে আল্লাহর যিকিরে মশগুল থেকে সূর্য উদয় হওয়ার পর দুই রাকাত নফল নামাজ (ইশরাক) আদায় করবে, সে পরিপূর্ণ এক হজ্জ ও ওমরার সওয়াব পাবে।’ ‘পরিপূর্ণ’ এ শব্দটি তিনি তিনবার বলেছেন। (তিরমিযি ৫৮৬)

➲ তুলনাহীন গণিমত লাভ করবে

উমর ইবনুল খাত্তাব ﵁ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজদের দিকে এক অভিযানে একটি সেনাদল পাঠান। তারা প্রচুর গণিমতের সম্পদ অর্জন করে এবং তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। তাদের সাথে যায়নি এমন এক লোক বলল, অল্প সময়ের মধ্যে এত পরিমাণে উত্তম গণিমত নিয়ে এদের চেয়ে তাড়াতাড়ি আর কোন সেনাদলকে আমরা ফিরে আসতে দেখি নি।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘আমি কি তোমাদেরকে এমন এক দলের কথা বলব না যারা এদের চেয়ে তাড়াতাড়ি উত্তম গণিমত নিয়ে ফিরে আসে? যারা ফজরের নামাজের জামা’আতে হাযির হয়, (নামাজ শেষে) সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে আল্লাহ্ তা’আলার যিকির করতে থাকে, তারাই অল্প সময়ের মধ্যে উত্তম গণিমতসহ প্রত্যাবর্তনকারী।’ (তিরমিযি, ৩৬৪১)

➲ কেয়ামতের দিন সরাসরি আল্লাহকে দেখার সৌভাগ্য লাভ

আর এটি হচ্ছে সর্বোত্তম পুরস্কার। জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ আল বাজলী ﵁ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

এক রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে ছিলাম। হঠাৎ তিনি পূর্ণিমার রাতের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘শোন! নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে তেমনি স্পষ্ট দেখতে পাবে, যেমন স্পষ্ট ঐ চাঁদকে দেখতে পাচ্ছ। তাঁকে দেখতে তোমরা কোনো ভিড়ের সম্মুখীন হবে না। কাজেই তোমরা যদি সূর্য উঠার আগের নামাজ ও সূর্য ডুবার আগের নামাজ আদায়ে সমর্থ হও, তাহলে তাই কর। তারপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন, “সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসার তাসবীহ্ পাঠ করুন।” (বুখারি, ৫৭৩)

➲ ফজরের নামাজ দিয়ে দিনটা শুরু করলে, পুরো দিনের কার্যক্রমের একটা বরকতম সূচনা হবে

প্রিয়নবী ﷺ বলেছেন, ‘হে আল্লাহ! আমার উম্মতের জন্যে, তার সকাল বেলায় বরকত দান করুন। ’ (তিরমিযী)

বৈজ্ঞানিক উপকারিতা

ফজরের সময় নামাজ আদায় করলে সারারাত ঘুমের পর হালকা অনুশীলন হয়। এ সময় পাকস্থলী খালি থাকে তাই কঠিন অনুশীলন শরীরের জন্য ক্ষতিকর। এ সময়ে নামাজ আদায় করলে নামাজির

অবসাদগ্রস্ততা ও অচলতা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। মস্তিস্কে রক্ত চলাচল বেড়ে পুনরায় চিন্তা করার জন্য প্রস্তুত হয়।

এ সময়ে দেহ পরিষ্কার, দাঁত পরিষ্কার, অঙ্গ ধোয়া ও পেশাব-পায়খানা থেকে পবিত্রতা অর্জন করা হয়। এতে জীবাণুর আক্রমণ থেকে বাঁচা যায়। তেমনি নামাজিরা হেঁটে হেঁটে মসজিদে যাওয়ার ফলে হালকা ব্যবহার হয়ে থাকে তা স্বাস্থ্যের খুবই উপকারী। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেন, অন্ত্ররোগ ও আলসার থেকেও বাঁচা যায়। রোমের পাদরি হিলার বলেন, ভোরের নামাজের জন্য ওঠা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যাশ্চর্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

জোহর

দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের মধ্যে অন্যতম জোহরের নামাজ। দ্বিপ্রহরে সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে এই নামাজের সময় শুরু হয়। মেরাজের সময় মহান আল্লাহ মুসলমানদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফজর করেন। মেরাজ থেকে ফিরে মহানবী (সা.) সর্বপ্রথম জোহরের নামাজ আদায় করেন। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে জোহরের নামাজ ও এর সময়ের ব্যাপারে আলোচনা রয়েছে।

জোহরের নামাজের ফজিলত

অনেকে জোহরের শুধু ফরজটুকু পড়েন। আগে-পরের সুন্নত পড়েন না। কেউ অলসতার কারণে; আর কেউ হয়তো কাজের ব্যস্ততা কিংবা সময়স্বল্পতার কারণে। অথচ জোহরের ফরজ নামাজের আগের চার

রাকাত সুন্নত হলো– সুন্নাতে মুআক্কাদা।

কখনো জোহরের নামাজের আগে চার রাকাত সুন্নত পড়তে না পারলে, জোহরের পর দুই রাকাত সুন্নত পড়ার পর আগের চার রাকাত সুন্নত আদায় করে নেওয়া কর্তব্য।

জোহরের সুন্নতের গুরুত্ব

জোহরের নামাজের পূর্বাপর সুন্নত সম্পর্কে রাসুল ﷺ এর অনেকগুলো হাদিস বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন হাদিসে এই চার রাকাত ও ফরজের পরের দুই রাকাত সুন্নতের ব্যাপারে বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আলী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত এক হাদিসে আছে, 'রাসুল ﷺ জোহরের আগে চার রাকাত সুন্নত ও জোহরের পর দুই রাকাত সুন্নত পড়তেন। (তিরমিজি, ১/৫৫০)

উম্মে হাবিবা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি জোহরের পূর্বে এবং পরে চার রাকাত নামাজ আদায় করবে, জাহান্নামের আগুন আল্লাহ তাআলা তার ওপর হারাম করে দিবেন।' (তিরমিজি, ১/৫৫৩)

আবু সুফিয়ান رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার বোন উম্মে হাবিবা رضي الله عنه (প্রিয় নবীজীর ﷺ এর বিবি) কে একথা বলতে শুনেছি যে, আমি স্বয়ং রাসুল ﷺ থেকে শুনেছি। তিনি ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি জোহরের নামাজের পূর্বের এবং পরের সুন্নত নামাজের পূর্ণ খেয়াল

রাখবে (নিয়মিত আদায় করবে), মহান আল্লাহ তায়ালা তার থেকে জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেবেন।' (তিরমিজি, ১/৫৫৪)

ফজর ও জোহর নামাজের পূর্ববর্তী সুন্নত নামাজ সম্পর্কে আয়েশা ﵂ বলেন, 'রাসুল ﷺ কখনই জোহরের পূর্বের চার রাকাত সুন্নত ও ফজরের পূর্বের দুই রাকাত সুন্নত ছাড়তেন না।' (বুখারি, ১১৮২)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয়ই আসমানের দুয়ারসমূহ খুলে দেওয়া হয় সূর্য মধ্যাকাশ থেকে পশ্চিমাকাশের দিকে হেলে পড়ার সময়। এরপর জোহরের নামাজ পর্যন্ত তা আর বন্ধ হয় না।" (সহিহুল জামে, ১৫৩২)

অর্থাৎ ঠিক দ্বিপ্রহরের পর থেকে জোহরের নামাজ পর্যন্ত সময়কে এখানে বুঝানো হয়েছে। এ সময়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ জোহরের ৪ রাকাত সুন্নত কখনও বাদ দিতেন না।

বৈজ্ঞানিক উপকারিতা

আমাদের দেশে অধিকাংশ অফিস শুরু হয় সকাল ৯টা থেকে সকাল ১০টার মধ্যে। ১০টা থেকে এক টানা ৩-৪ ঘণ্টা কাজ করলে মানসিকভাবে অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে, সাথে মানসিক অস্থিরতাও কাজ করা শুরু করে দেয়। ঠিক তখনই একটা ফ্রেসনেস এর প্রয়োজন পড়ে। সে ফ্রেশনেস এনে দিতে পারে জোহরের নামাজ। এছাড়া ধুলা, ময়লা, বিষাক্ত কেমিকেল দেহে লেগে শরীরে জীবাণু আক্রমণ করে। ওযু করা নামাজ পড়া, বিশেষ করে সিজদাতে মস্তিষ্ক চাঙ্গা হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানীরা

গবেষণা করে পেয়েছেন, যারা নিয়মিত জোহরের নামাজ আদায় করেন তারা মানসিকভাবে অনেক চাঙ্গা থাকেন। মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখার উপায় হল নিয়মিত জোহরের নামাজ আদায় করা।

বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে পেয়েছেন, সূর্য যখন মাথার উপরে চলে আসে তখন এক ধরণের রশ্মি বিকিরণ করে, এতে মানুষের মন মানসিকতা খারাপ হয়ে যায়, মানুষের চাঞ্চল্যতা কমে যায়। ফলে মানসিকভাবে ভালো থাকে না। যদি সেই মুহূর্তে ওযু করা যায় তবে মানসিক চাঞ্চল্যতা ফিরে আসে। এর কারণ হিসেবে বিজ্ঞানীরা বলেছেন, মানুষ যখন ঘার মাসেহ করে তখন ঘার বা গর্দান ভেজা ভেজা হয়ে যায়। এটি স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী, এমনকি ঘার ভেজা থাকলে ক্যান্সারের মতো জটিল রোগ থেকেও মুক্তি মেলে। আর জোহরের নামাজ আদায় করা যায় তবে তো আর কথাই নেই। সিজদা করার মাধ্যমে মস্তিস্কে রক্ত চলাচল বেড়ে যায় ফলে কর্ম চাঞ্চল্যতা ফিরে আসে।

আসর

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের তৃতীয় হচ্ছে আসর। সূর্য হেলে পড়লে এবং তেজস্ক্রিয়তা কমে গেলে চার রাকাত বিশিষ্ট এ নামাজ পড়া প্রত্যেক বালেগ মুসলমান নারী-পুরুষের ওপর ফরজ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘নিশ্চয় নামাজ মানুষকে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।’ তাছাড়াও নামাজের মধ্যে মানুষের জন্য রয়েছে অসংখ্য ফজিলত ও উপকারিতা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজর এবং আসরের নামাজের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। আসরের

সময় ব্যবসা-বাণিজ্য, খেলাধুলা এবং চিত্তবিনোদনে মানুষের ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এ সকল কারণে মানুষ ফজর এবং আসরের নামাজ যথা সময়ে পড়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। সুতরাং যে ব্যক্তি এ দুই ওয়াক্ত নামাজ যথা সময়ে আদায় করে তাঁর জন্য অন্যান্য ওয়াক্তের নামাজ আদায় সহজ হয়ে যায়।

আসরের নামাজের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। হাদিসে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ﵁ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন, 'যদি কোনো ব্যক্তির আসরের নামাজ ছুটে যায়, তা হলে যেন তার পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদ সবকিছুই ধ্বংস হয়ে গেল।' (বুখারি, ৫৫২)

হজরত ওমারা ইবনে রুওয়াইবা ﵁ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, 'এমন ব্যক্তি কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যে সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে নামাজ পড়বে অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামাজ।' (মুসলিম)

আসরের নামাযের ফযিলত

আবূ মুসা ﵁ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দুই ঠাণ্ডার নামায পড়ে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (সহীহুল বুখারী ৫৭৪, মুসলিম ৬৩৫, আহমাদ ১৬২৮৯, দারেমী ১৪২৫)

আবু মালিহ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- এক যুদ্ধে আমরা বুরাইদাহ ﵁-এর সঙ্গে ছিলাম। দিনটি ছিল মেঘলা। তাই বুরাইদাহ ﵁ বলেন, শিগগির আসরের নামাজ আদায় করে নাও। কারণ নবী ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আসরের নামাজ ছেড়ে দেয়, তার আমল বিনষ্ট হয়ে যায়।’ (বুখারি, ৫৫৩)

আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল ﷺ বলেছেন, ‘ফেরেশতারা পালাবদল করে তোমাদের মাঝে এসে থাকেন। এক দল দিনে, এক দল রাতে। আসর ও ফজরের সালাতে উভয় দল একত্র হয়। অতঃপর তোমাদের রাত যাপনকারী দলটি উঠে যায়। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের জিজ্ঞাসা করেন, আমার বান্দাদের কোন অবস্থায় রেখে এলে? অবশ্য তিনি নিজেই এই বিষয়ে সবচেয়ে বেশি জানেন। উত্তরে তারা বলে, আমরা আপনার বান্দাদের সালাতে রেখে এসেছি। আর আমরা যখন গিয়েছিলাম, তখনও তারা সালাত আদায়রত অবস্থায় ছিল।’ (বুখারি, ৫৫৫)

আবু হুরাইরা ﵁ হতে বর্ণিত হাদিসে রাসুল ﷺ আরো বলেন, ‘তোমাদের কেউ যদি সূর্যাস্তের আগে আসরের নামাজে এক সিজদা পায়, তাহলে সে যেন সালাত পূর্ণ করে নেয়। আর যদি সূর্যোদয়ের আগে ফজরের সালাতের এক সিজদা পায়, তাহলে সে যেন সালাত পূর্ণ করে নেয়।’ (বুখারি, ৫৫৬)

আসরের চার রাকাত সুন্নতের গুরুত্ব

আসরের সালাতের আগে ৪ রাকায়াত সুন্নাত রয়েছে। এটি গায়রে মুওয়াক্কাদা, তাই আদায় করা উত্তম। রাসুল ﷺ নিজেও এই নামাজ আদায় করেছেন এবং সাহাবায়ে-কেরামকে বিশেষভাবে তা পড়ার তাগিদ দিতেন। আলী ইবনে আবু তালিব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল ﷺ আসরের ফরজ নামাজে আগে চার রাকাত সুন্নত পড়তেন। (তিরমিজি, ৪২৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, ১১৬১)

অন্য একটি হাদিসে রয়েছে, উমর ফারুক ﷺ হতে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ সেই ব্যক্তিদের ওপর রহম করুন, যারা আসরের সালাতের আগে চার রাকাত সুন্নত আদায় করে।' (আবু দাউদ, ১২৭১; তিরমিজি, ৪৩০)

আলী ইবনে আবী তালেব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী ﷺ আসরের ফরয নামাযের আগে চার রাকআত সুন্নত পড়তেন। তার মাঝখানে নিকটবর্তী ফেরেশতাবর্গ ও তাঁদের অনুসারী মুসলিম ও মুমিনদের প্রতি সালাম পেশ করার মাধ্যমে পার্থক্য করতেন।' (অর্থাৎ চার রাকআতে দু' রাকআত পর পর সালাম ফিরতেন।' (তিরমিযী, ৪২৯; ইবনু মাজাহ, ১১৬১)

বৈজ্ঞানিক উপকারিতা

পৃথিবী বৃত্তীয় ও লম্ব দুই ধরনের গতিতে চলে। যখন সূর্য ঢলতে থাকে তখন পৃথিবীর ঘূর্ণন কমতে থাকে। এমনকি আসরের সময় একেবারেই কমে যায়। এ সময় রাতের অনুভূতি প্রবল হতে থাকে ও প্রকৃতির মধ্যে স্থবিরতা এবং অবসাদগ্রস্ততা প্রদর্শিত হতে থাকে। আসরের নামাজের সময় অবচেতন অনুভূতির শুরু হয়। এ সময় নামাজ আদায় করলে অতিরিক্ত অবসাদগ্রস্ততা, অবচেতন অনুভূতি, মানসিক চাপ ও অস্থিরতা কমে যায়। সূর্যের রশ্মি নামাজিকে প্রশান্তি দান করে।

মাগরিব

মাগরিবের নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের অন্যতম। সন্ধ্যায় সূর্য পুরোপুরি ডুবে গেলে মাগরিবের নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয়। আর পশ্চিম আকাশে দিগন্ত লালিমা শেষ হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের নামাজ পড়া যায়। তবে সূর্যাস্তের পর বিলম্ব না করে মাগরিবের নামাজ আদায় করে নেওয়া মুস্তাহাব।

সালামা ﵁ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘সূর্য পর্দার আড়ালে ঢাকা পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা নবী ﷺ-এর ইমামতিতে মাগরিবের নামাজ আদায় করতাম।’ (বুখারি, ৫৬১)

অন্য এক হাদিসে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, ‘আমার উম্মত ততদিন কল্যাণের মধ্যে থাকবে অথবা মূল অবস্থায় থাকবে, যতদিন তারা মাগরিবের নামাজ আদায়ে তারকা উজ্জ্বল হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব না

করবে।’ (আবু দাউদ, ৪১৮)

অর্থাৎ যথাসম্ভব সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গেই মাগরিবের নামাজে দাঁড়িয়ে যাওয়া, বিলম্ব করা অনুচিত।

মাগরিবের নামাজের ফজিলত

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেন, ‘আপনি অধিকহারে আপনার পালনকর্তাকে স্মরণ করুন। আর সকাল-সন্ধ্যায় তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন।’ (সূরা আলে ইমরান, ৪১)

তাফসিরবিদরা বলেন, এই আয়াতে পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে নামাজ আদায় করা। এই আয়াতে ফজর ও মাগরিবের নামাজের প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কারণ এ দুই সময়ে প্রকৃতিতে বড় দুটো পরিবর্তন হয়। দিন ও রাতের পালাবদল ঘটে।

আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত। নবীজি ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি সকাল এবং সন্ধ্যায় নামাজ আদায় করতে মসজিদে যায় এবং যতবার যায় আল্লাহ তায়ালা ততবারই তার জন্য জান্নাতের মধ্যে মেহমানদারির উপকরণ প্রস্তুত করেন।’ (বুখারি, ৬২২)

মাগরিবের নামাজের সুন্নতের ফজিলত

বর্ণিত আয়াত ও হাদিস থেকে সকাল-সন্ধ্যার ইবাদতের বিশেষ গুরুত্ব ও ফজিলতের বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। এমনকি উল্লিখিত হাদিস থেকে এ-ও বোঝা যায়, মাগরিবের নামাজ অতি বরকতময়।

মাগরিবের ফরজ নামাজের পর সুন্নত নামাজের কথা হাদিসে বিদ্যমান রয়েছে। এমনকি এর ফজিলতও অপরিসীম।

‘যে ব্যক্তি গুরুত্বের সঙ্গে মাগরিবের পরের দুই রাকাত সুন্নত নামাজ আদায় করবে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হয়।’ (তিরমিজি, ৬৩৬২)

বৈজ্ঞানিক উপকারিতা

সারাদিন মানুষ জীবিকার জন্য শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করে কাটায়। মাগরিবের সময় ওযু করে নামাজ আদায়ের ফলে আত্মিক ও দৈহিক প্রশান্তি লাভ হয়। সারাদিনের ময়লা ওযুর মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে ত্বক হয় তরতাজা।

এশা

সারা দিনের ক্লান্তি, পরিবারের লোকদের সঙ্গে আড্ডা, ঘুমের তাড়না ইত্যাদি কারণে এশার নামাজের প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয়। এ জন্য রাসুল ﷺ একাধিক হাদিসে বিশেষভাবে এ নামাজের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। এশার নামাজ আদায়ের ফজিলত বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। এখানে জানার সুবিধার্থে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

এশার নামাযের ফজিলত

অর্ধেক রাত ইবাদত করার সওয়াব

আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি জামাতের সঙ্গে এশার নামাজ

আদায় করল, সে যেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত (নফল) নামাজ আদায় করল। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করল সে যেন সারা রাত জেগে নামাজ আদায় করল।' (মুসলিম, ১৩৭৭)

অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'যে ব্যক্তি এশা ও ফজর জামাতের সঙ্গে পড়ল, সে যেন সারা রাত দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ল।' (মুসলিম, ৬৫৬)

মুনাফিকের তালিকা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়

রাসুল ﷺ বলেছেন, 'মুনাফিকদের জন্য ফজর ও এশার নামাজের চেয়ে অধিক ভারী কোনো নামাজ নেই। এ দুই নামাজের ফজিলত যদি তারা জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা উপস্থিত হতো।' (বুখারি, ৬৫৭)

উবাই ইবনে কাব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, 'একবার মহানবী ﷺ আমাদের ফজরের নামাজ পড়িয়েছেন। সালাম ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করেন, অমুক কি আছে? লোকেরা বলল, নেই। তারপর আরেকজনের নাম নিয়ে জিজ্ঞেস করেন, অমুক কি আছে? লোকেরা বলল, নেই। তিনি বলেন, এ দুই নামাজ (এশা ও ফজর) মুনাফিকদের জন্য সবচেয়ে কঠিন। তোমরা যদি জানতে যে এই দুই নামাজে কী পরিমাণ সওয়াব আছে, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে শরিক হতে।' (আবু দাউদ, ৫৫৪)

হজরত ইবনে ওমর ﷺ বলেন, ‘আমাদের মধ্যে কেউ যদি এশা ও ফজরের জামাতে উপস্থিত না হতো, তবে আমরা মনে মনে ভাবতাম, হয়তো সে মুনাফিক হয়ে গেছে। (বাজজার, তাবারানি, ইবনে খুজায়মা)

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, ‘এশা ও ফজরের নামাজে পরিচিত মুনাফিক ও অসুস্থ ব্যক্তি ছাড়া কাউকে অনুপস্থিত দেখা যেত না।’ (মুসলিম)

বৈজ্ঞানিক উপকারিতা

অনেকেই সারাদিন কাজ করে রাতের বেলায় বাসায় ফিরে থাকে আর বাসায় ফিরেই রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে রাতে খাবার খাওয়ার সাথে সাথে ঘুমিয়ে পরলে শরীরে অনেক রোগ বাসা বাঁধতে পারে। তাই রাতে খাওয়ার পর হালকা ব্যায়াম করার পর ঘুমাতে যাওয়া উচিৎ। এশার নামাজ ব্যায়ামের চেয়েও বেশি উপকারি এ নামাজ আদায়ে শান্তি পাওয়া যায়, খাদ্য হজম হয় এবং অস্থিরতা দূর করে।

তাহাজ্জুদ (কিয়ামুল লাইল)

জমহুর ওলামায়ে কেরাম এবং বিশ্বনবীর হাদিস শরিফের বিশুদ্ধ মতামত যে, কিয়ামুল লাইল হলো এমন এক বিশেষ নফল নামাজ, যে নামাজকে তাহাজ্জুদ বলেই আমরা জানি। গভীর রজনীতে আল্লাহর একান্ত সান্নিধ্য ও নৈকট্য অর্জনের আশায় দুনিয়ার সব ব্যস্ততাকে দূরীভূত করে কায়মনোবাক্যে নিজের মস্তক অবনত করা। আল্লাহর খালিস বান্দা হওয়ার জন্য, নিজের মনের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনা, আকুতি

পেশ করার উত্তম মাধ্যম হলো কিয়ামুল লাইল (তাহাজ্জুদ) নামাজ।

নফসের কুপ্রভাব, প্রতারণা ও ধোঁকা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে এবং নফসের উন্নতি সাধনে এই নামাজের কার্যকারিতা অতুলনীয়। কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হচ্ছে, 'নিশ্চয় ইবাদতের জন্য রাতে ওঠা প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল।' (সুরা মুয্যাম্মিল, ৬)।

সুতরাং রাতে জেগে মনের সব কালিমা মোচনের জন্য কিয়ামুল লাইল অধিক ফলপ্রসূ। আর নফসের বিরুদ্ধে জয়ী হতে হলে মুমিনের রাত জাগরণ করা জরুরি। সুন্নাত, ওয়াজিব, মুস্তাহাব, সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, সুন্নাতে জায়িদাহ, চাশতের সালাত, ইশরাকের সালাত, সালাতুত তাসবিহ, সালাতুত তাওবা, তাহাজ্জুদের সালাত, ইসতিখারার সালাত ইত্যাদি সালাতের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট সালাত হচ্ছে তাহাজ্জুদ। তাহাজ্জুদের নামাজ নবী করিম ﷺ এর ওপর ফরজ ছিল। উম্মতের ওপর এটি ফরজ না হলেও সব সুন্নাত নামাজের মধ্যে এটিই উত্তম।

তাহাজ্জুদ অর্থ ঘুম থেকে জাগা আর তাহাজ্জুদের সময় হলো ইশার নামাজ পড়ে ঘুমিয়ে তারপর অর্ধেক রাতের পর নামাজ আদায় করা। সুবহে সাদিকের আগ পর্যন্ত তাহাজ্জুদের ওয়াক্ত থাকে। গভীর রাতে ঘুম থেকে জেগে নামাজ আদায়ে সাওয়াব বেশি। যারা শেষ রাতে ইবাদত ও প্রার্থনা করেন তাদের প্রশংসাস্বরূপ কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, "তারা রাতের সামান্য অংশই নিদ্রায় অতিবাহিত করে এবং রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে।" (সূরা আয-যারিয়াত, ১৭-১৮)

রাসূল ﷺ কে সম্বোধন করে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক আরো বলেন, “আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ পড়বে। এটা তোমার অতিরিক্ত দায়িত্ব। অচিরেই তোমার রব তোমাকে প্রশংসিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন।” (সূরা বনী ইসরাঈল, ৭৯)

তাকে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করতে বলা হয়েছে। তাহাজ্জুদের নামাজ একটি অতিরিক্ত ফরজ, যা নবী ﷺ এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। অবশ্য উম্মতের জন্য তাহাজ্জুদের নামাজ ফরজ নয়। তাহাজ্জুদের নামাজ সুন্নতে মুয়াক্কাদা। এই নামাজ নেককারদের বৈশিষ্ট্য।

সূরা আল ফুরকান-এর ৬৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, “আল্লাহর প্রিয় বান্দা তারা, যারা তাদের রবের দরবারে সিজদা করে এবং দাঁড়িয়ে থেকেই রাত কাটিয়ে দেয়।” ইসলামের প্রাথমিক যুগে কুফর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিজিত হওয়ার পেছনে মূল ভূমিকা ছিল যে, তারা রাতের শেষ ভাগে আল্লাহ তায়ালার মহান দরবারে চোখের পানি ফেলতেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।

“তারা ছিল কঠিন পরীক্ষায় পরম ধৈর্যশীল, অটল-অবিচল, সত্যের অনুসারী, পরম অনুগত। আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ উৎসর্গকারী এবং রাতের শেষ প্রহরে আল্লাহর কাছে ভুলত্রুটির ক্ষমাপ্রার্থী।” (সূরা আলে ইমরান, ১৭)

মিশকাতুল মাসাবিহ গ্রন্থকার সুনানে আহমদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আবু হোরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে

বলতে শুনেছি, ‘আফজালুস সালাতি বাদাল মাফরুদাতি সালাতুল লাইলি’ অর্থাৎ ফরজ নামাজের পর সবচেয়ে উত্তম নামাজ হলো তাহাজ্জুদের নামাজ। (হাদিস নম্বর ১১৬৭/২)

হজরত আবু হোরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত অপর এক হাদিসে রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘আল্লাহ প্রতি রাতেই নিকটবর্তী আসমানে অবতীর্ণ হন যখন রাতের শেষ তৃতীয়ভাগ অবশিষ্ট থাকে। তিনি তখন বলতে থাকেন, কে আছো যে আমায় ডাকবে, আর আমি তার ডাকে সাড়া দেবো? কে আছো যে আমার কাছে কিছু চাইবে, আর আমি তাকে তা দান করব? কে আছো যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আর আমি তাকে ক্ষমা করব?’ (বুখারি ও মুসলিম)

শরহে সুন্নাহর বরাত দিয়ে মিশকাতুল মাসাবিহ গ্রন্থকার আবু সাঈদ খুদরি ﵁ বর্ণিত একটি হাদিসের উল্লেখ করেন। বলা হয়েছে, ‘রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ খুশি হন (হাসেন) যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদের জন্য উঠেন এবং নামাজ পড়েন; জনতা, যারা নামাজের জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায়; মুজাহিদ যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায়।’ (হাদিস নম্বর ১১৬০/২)

তাহাজ্জুদ নামাযের ফজিলত

আশা-আশঙ্কায় তাহাজ্জুদ পড়েন নেককাররা

শেষ রাতে মানুষ যখন গভীর ঘুমে মগ্ন, তখন তারা প্রভুর ভালোবাসায় বিনিদ্র হয়ে যায়। ইরশাদ হয়েছে, ‘তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের

প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশঙ্কায়। আর আমি তাদের যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে।’ (সূরা সাজদা, ১৬)

শুধু নামাজ নয়, রাতের শেষ ভাগে আল্লাহর দরবারে চোখের পানি ফেলা ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া খাঁটি ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য। ঈমানদারদের গুণাবলি সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে– “তারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত ব্যয়কারী ও রাতের শেষ প্রহরে ক্ষমাপ্রার্থী।” (সূরা আলে ইমরান, ১৭)

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর শ্রেষ্ঠ নামাজ তাহাজ্জুদ

তাহাজ্জুদ নামাজ হলো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর শ্রেষ্ঠ নামাজ। মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, ‘রমজানের পর সর্বশ্রেষ্ঠ রোজা হলো আল্লাহর মাস মহররমের রোজা। আর ফরজ নামাজের পর সর্বশ্রেষ্ঠ নামাজ হলো রাতের (তাহাজ্জুদের) নামাজ।’ (মুসলিম, ১১৬৩)

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আ’স رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, ‘হে আবদুল্লাহ! তুমি অমুক ব্যাক্তির মত হয়ো না, সে রাত জেগে ইবাদাত করত, পরে রাত জেগে ইবাদাত করা ছেড়ে দিয়েছে। (বুখারি, ১১৫২)

রাসূল ﷺ বলেন, ‘যে ব্যক্তি রাতে ঘুম থেকে জেগে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে এবং সে তার স্ত্রীকেও ঘুম থেকে জাগিয়ে নামাজ পড়ায়, এমনকি সে যদি জেগে না ওঠে, তবে তার মুখে খানিকটা পানি ছিটিয়ে দেয় তাহলে তার প্রতি আল্লাহ রহমত বর্ষণ করে থাকেন। অনুরূপ

কোনো মহিলা যদি রাতে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে এবং সে তার স্বামীকে নামাজের জন্য জাগায়, এমনকি স্বামী না জাগলে স্ত্রী তার মুখে পানি ছিটিয়ে তার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়, তাহলে তার প্রতিও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হতে থাকে।' (আবু দাউদ, নাসায়ী, মিশকাত)

আরেক হাদীসে এসেছে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদের জন্য রাতে ওঠে এবং স্ত্রীকেও জাগিয়ে দেয়; অতঃপর দুজনে একসাথে দুই রাকাত নামায আদায় করে তাদেরকে যাকিরীনের মধ্যে গণ্য করা হয়, যারা বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করে।' (সুনানে আবু দাউদ, ১৩০৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, ১৩৩৫)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের সালাতের জন্য খুব পরিশ্রম করতেন এমনকি তার কদম মোবারক ফেটে যেত; তিনি রাতের কিয়ামে প্রচুর কষ্ট করতেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে এত কিয়াম করতেন যে, তার দুই পা ফেটে যেত। আয়েশা তাকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আপনি কেন এরূপ করেন, অথচ আল্লাহ আপনার পূর্বাপর সব গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন? তিনি বললেন, আমি কি আল্লাহর শোকর গুজার বান্দা হতে পছন্দ করব না। (সহীহ বুখারী, ৪৮৩৭; মুসলিম ২৮২০)

মুগিরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ কিয়াম করলেন, ফলে তার দুই পা ফুলে গিয়েছিল। তাকে বলা হলো, আপনার পূর্বাপর সব

গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন? তিনি বললেন, আমি কি শোকর গুজার বান্দা হবো না। (সহীহ বুখারী ৪৮৩৬; মুসলিম, ২৮১৯)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক সাহাবী খুব সুন্দর বলেছেন, আমাদের মাঝে আল্লাহর রাসূল ﷺ রয়েছেন, যিনি তার কিতাব তিলাওয়াত করেন যখন উজ্জ্বল ফজর উদিত হয়। তিনি বিছানা থেকে পার্শ্বদেশ পৃথক রেখে রাত যাপন করেন, যখন কাফেররা গভীর ঘুমে নিমজ্জিত থাকে।

জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম উপায় রাতের সালাত

আব্দুল্লাহ ইবন সালাম رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ মদিনায় আগমন করেন, তখন লোকেরা তার দিকে ছুটে গেল। আর চারদিকে ধ্বনিত হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করেছেন তিনবার। আমি মানুষের সাথে তাকে দেখতে গেলাম। আমি যখন তার চেহারা ভালোভাবে দেখলাম, পরিষ্কার বুঝলাম তার চেহারা কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়। আমি সর্বপ্রথম তাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ‘হে লোকেরা, তোমরা সালামের প্রসার কর, খাদ্য দান কর, আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখ ও রাতে সালাত আদায় কর যখন মানুষেরা ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।’ (ইবন মাজাহ, ৩২৫১, ১৩৩৪; তিরমিযী, ২৪৮৫, ১৯৮৪)

কিয়ামুল লাইল : জান্নাতীদের বৈশিষ্ট্য

পবিত্র কুরআনে মুত্তাকীদের জন্য জান্নাতের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। “সেদিন নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা থাকবে প্রস্রবণবিশিষ্ট জান্নাতে।” (সূরা যারিয়াত, ১৫)

সাথে তাদের কিছু গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের বিবরণও এসেছে। তন্মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল- “রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত।” (সূরা যারিয়াত, ১৮)

ইবাদুর রহমান-রহমানের বান্দাদের কতিপয় বৈশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে কুরআনে কারীমের সূরা ফুরকানে। সেখানেও উপরোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যটি বিবৃত হয়েছে- “আর তাঁরা রাত অতিবাহিত করে তাঁদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদারত হয়ে এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।” (সূরা ফুরকান, ৬৪)

সূরার শেষের দিকে তাদের পুরস্কারের বিবরণও এসেছে- “তাদের প্রতিদান দেয়া হবে জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষ। কারণ তারা ছিল ধৈর্যশীল। তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে তা কত উৎকৃষ্ট। (সূরা ফুরকান, ৭৫-৭৬)

রাতে সালাত আদায়কারীর জন্য জান্নাত উঁচু প্রাসাদ তৈরি করা হয়েছে

আবু মালেক আশআরী ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘নিশ্চয় জান্নাতে কতক বালাখানা রয়েছে, যার বাহির ভেতর থেকে ও ভেতর বাহির থেকে দেখা যাবে। যা আল্লাহ তৈরি করেছেন তাদের জন্য

যারা খাদ্য দান করে, বিনয়াবনত কথা বলে, সিয়ামের পর সিয়াম পালন করে, সালামের প্রসার করে এবং রাতে সালাত আদায় করে যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে।’ (আহমদ, ৫/৩৪৩); ইবন হিব্বান, ৬৪১; তিরমিযী, ২৫২৭)

আল্লাহতাআলা সাক্ষ্য দিয়েছেন রাতে সালাত আদায়কারীগণ পূর্ণ ঈমানদার

তিনি বলেছেন, “আমার আয়াতসমূহ কেবল তারাই বিশ্বাস করে, যারা এর দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হলে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ করে। আর তারা অহংকার করে না। তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে আলাদা হয়। তারা ভয় ও আশা নিয়ে তাদের রবকে ডাকে। আর আমরা তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে।” (সূরা আস-সাজদাহ, ১৫-১৬)

যারা রাতে সালাত আদায় করে ও যারা করে না তারা উভয় সমান নয়

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, “যে ব্যক্তি রাতের প্রহরে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রবের রহমত প্রত্যাশা করে সে কি তার সমান যে এরূপ করে না বল, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান? বিবেকবান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।” (সূরা আয-যুমার, ৯)

রাতের সালাত গুনাহের কাফফারা ও পাপ মোচনকারী

আবু উমামা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘তোমরা রাতের সালাত আঁকড়ে ধর, কারণ এটা তোমাদের পূর্বের নেককার

লোকদের অভ্যাস এবং তোমাদের রবের নৈকট্য দানকারী, গুনাহের কাফফারা ও পাপ মোচনকারী।’ (তিরমিযী, ৩৫৪৯; হাকেম, ১/৩০৮); বায়হাকি, ২/৫০২)

কিয়ামুল লাইল মুমিনদের সম্মান

সাহল ইবন সাদ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জিবরীল ﵇ নবী ﷺ এর নিকট আগমন করলেন, অতঃপর বললেন, ‘হে মুহাম্মাদ! যত দিন পার বেঁচে নেও, অতঃপর অবশ্যই তুমি মারা যাবে। যাকে ইচ্ছা মহব্বত কর, অবশ্যই তার থেকে তুমি বিচ্ছেদ হবে। যা ইচ্ছা আমল কর, তার প্রতিদান অবশ্যই তোমাকে দেওয়া হবে। অতঃপর বলেন, হে মুহাম্মাদ মুমিনের সম্মান হচ্ছে রাতের সালাত, আর তার ইজ্জত হচ্ছে মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষিতা।’ (হাকেম, ৪/৩২৫)

রাতে সালাত আদায়কারী ঈর্ষার পাত্র

কারণ এর সাওয়াব অধিক। এ সালাত দুনিয়া ও তার মধ্যে বিদ্যমান সবকিছু থেকে উত্তম। আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘দুজন ব্যতীত কোন ঈর্ষা নেই। এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ কুরআন দান করেছেন, সে কুরআন নিয়ে রাত ও দিনের বিভিন্ন সময় কিয়াম করে। অপর ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, সে তা রাত ও দিনের বিভিন্ন সময় খরচ করে। (সহীহ মুসলিম, ৮১৫)

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘দুজন ব্যতীত কোন ঈর্ষা নেই। এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, সে তা সত্য পথে খুব খরচ করে। অপর ব্যক্তি যাকে আল্লাহ হিকমত দান করেছেন, সে তার মাধ্যমে ফয়সালা করে ও মানুষকে তা শিক্ষা দেয়।’ (সহীহ বুখারী, ৭৩; সহীহ মুসলিম, ৮১৬)

রাতের সালাতে কুরআন তিলাওয়াত করা বড় গণিমত ও সৌভাগ্য

আব্দুল্লাহ ইবন আমর ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি দশ আয়াত দ্বারা কিয়াম করল, তাকে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হবে না। আর যে একশত আয়াত দ্বারা কিয়াম করল, তাকে কানেতিনদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হবে। আর যে এক হাজার আয়াত দ্বারা কিয়াম করল, তাকে মুকানতিরিনদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হবে।’ (আবু দাউদ, ১৩৯৮; সহীহ ইবন খুজাইমা, ২/১৮১, ১১৪২)

আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘তোমাদের কেউ কি পছন্দ করে, যখন সে বাড়িতে যাবে সেখানে সে তিনটি মোটাতাজা গাভীন উট (তার মালিকানাধীন) দেখবে? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমাদের কারো নিজ সালাতে তিনটি আয়াত তেলাওয়াত করা তিনটি মোটা তাজা উট হতে উত্তম।’ (সহীহ মুসলিম, ৮০২)

নবী ﷺ কুরআন খতমের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুম যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআন খতম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি বলেন, 'চল্লিশ দিনে, অতঃপর বলেন এক মাসে, অতঃপর বলেন পনেরো দিনে, অতঃপর বলেন দশ দিনে, অতঃপর বলেন সাত দিনে।' তিনি বলেন, আমি এর চেয়ে অধিক সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, 'তিন দিনের কমে যে খতম করবে, সে কুরআন বুঝবে না।' (আবু দাউদ, ১৩৯০)

উপরিউক্ত কুরআন ও হাদিসের বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, সালাতগুলোর মধ্যে তাহাজ্জুদ অতি মর্যাদাকর সালাত। এই সালাত প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীরই পালন করা উচিত। এই সালাতের মাধ্যমে হয়তো আল্লাহর নৈকট্য লাভ সহজ হবে। সৃষ্টিকর্তার সাথে যখন দূরত্ব কমে যাবে তখন সৃষ্টিকর্তা বান্দার দাবি রক্ষা করতে পারেন।

ইশরাক (চাশত)

ইশরাক শব্দের অর্থ হলো আলোকিত হওয়া। সূর্য পরিপূর্ণভাবে উদিত হওয়ার পর ইশরাকের নামাজ আদায় করতে হয়। রাসুলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাজের পর থেকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করতেন। ইশরাকের সময় হলো, বেলা ওঠার ১৫ মিনিট পর থেকে দ্বিপ্রহরের ৫ মিনিট আগ পর্যন্ত সময়। তবে উত্তম হলো, বেলা ওঠার এক থেকে দেড় ঘণ্টার মধ্যে ইশরাক পড়া ।

নবিজি ﷺ যখন ইশরাক পড়তেন

একদল ইসলামিক স্কলার বলেছেন, বর্শা মানে দেড় মিটারের মতো, আবার কেউ কেউ বলেছেন, এক মিটারের মতো। এটি সময়ের সঙ্গে পরিমাপ করলে দাঁড়ায়, সূর্য উদিত হওয়ার ১০ থেকে ১২ মিনিট পর শুরু হয়। ইশরাক নামাজ পড়া প্রসঙ্গে হাদিসের একাধিক বর্ণনা রয়েছে। তাহলো- হাদিসের দিকনির্দেশনা অনুসারে ফজর নামাজ পড়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সূর্য উঠার পর এ নামাজ আদায় করতে হয়। এ ক্ষেত্রে ইসলামিক স্কলারদের কেউ কেউ বলেছেন সূর্য উঠার ১০ থেকে ১৫ মিনিট পর; আবার কেউ কেউ বলেছেন ২০ থেকে ২৫ মিনিট পর এ নামাজ পড়তে হয়। আর সূর্য এক বর্শা পরিমাণ (দেড় মিটারের মতো) মধ্যাকাশের দিকে উঠা পর্যন্ত এ নামাজের ওয়াক্ত থাকে।

ইশরাকের নামাযের ফজিলত

এ নফল নামাজের ফজিলত বর্ণনায় একাধিক হাদিসে এসেছে,

আনাস ইবনে মালেক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি জামাআতের সঙ্গে ফজরের নামাজ পড়ল। অতপর সূর্য উঠা পর্যন্ত সেখানে বসে আল্লাহর জিকির করল; অতপর দাঁড়িয়ে দুই রাকাআত নামাজ পড়ল; সে একটি হজ ও ওমরাহ করার সাওয়াব নিয়ে ফিরে গেল।’ (তাবারানি, আত-তারগিব, তিরমিজি, মেশকাত)

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘সূর্য উঠার আগে আল্লাহর জিকির, তাকবির, তাহমিদ ও তাহলিল পাঠ করা আমার কাছে ইসমাঈল বংশের দুইজন গোলাম আজাদ করার চেয়েও অধিক প্রিয়। ’ (মুসনাদে আহমাদ)

হজরত আবু উমামাহ ﵁ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘এক নামাজের পর (ধারাবাহিক) আর এক নামাজ; যার মাঝখানে কোনো গোনাহ হয়নি, তা ইল্লিয়্যুন (উচ্চ মর্যাদায়) লেখা হয়।’ (আবু দাউদ)

আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, ‘আমার প্রিয়তম (রাসুল ﷺ) আমাকে তিনটি বিষয়ে অসিয়ত করেছেন, যেন আমি তা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ত্যাগ না করি। প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখা, দুহার নামাজ তথা ইশরাক বা চাশতের নামাজ ও ঘুমানোর আগে বিতর আদায় করা।’ (সহিহ বুখারি, ১১৭৮)

রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন, ‘মানুষের শরীরে ৩৬০টি জোড়া আছে। অতএব, মানুষের কর্তব্য হলো প্রত্যেক জোড়ার জন্য একটি করে সদকা করা। সাহাবায়ে কেরাম বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসুল! কার শক্তি আছে এই কাজ করার?’ তিনি বলেন, ‘মসজিদে কোথাও থুতু দেখলে তা ঢেকে দাও অথবা রাস্তায় কোনো ক্ষতিকারক কিছু দেখলে সরিয়ে দাও। তবে এমন কিছু না পেলে, চাশতের দুই রাকাত নামাজ এর জন্য যথেষ্ট।’ (আবু দাউদ, ৫২২২)

তাহিয়্যাতুল অজু

তাহিয়্যাতুল অজু। দুই রাকাত অভিবাদনের নামাজ। অভিবাদন বলতে– অজুকে অভিবাদন জানানো। দেখা-সাক্ষাতে মানুষ যেমন অন্যকে অভিবাদন জানায়, তেমনি অজু-মসজিদকে অভিবাদন জানানো হয়। অভিবাদন জানানো ইসলামের সৌন্দর্য। মুমিনরা সালাম-মুসাফাহার মাধ্যমে অভিবাদন জানিয়ে থাকে। আর মসজিদকে অভিবাদন জানানো হয়, আমলের মাধ্যমে। আর আমলটি হলো- দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল অজুর নামাজ।

স্বাভাবিকতই আমরা পবিত্রতার জন্য অজু করি। এই অজুরও অভিবাদনের সুন্দর পদ্ধতি রয়েছে। নবীজি (সা.) আমাদের তা শিখিয়েছেন। এটি তার সুন্নত। তাহিয়্যাতুল অজুর নামাজের মাধ্যমে বান্দার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। আর সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়।

তাহিয়্যাতুল অজুর নামাযের ফজিলত

তাহিয়্যাতুল অজুতে গুনাহ মাফ

ইসলামের তৃতীয় খলিফা উসমান رضي الله عنه একদিন তিনি অজুর পানি চাইলেন। অজু শুরু করে তিনবার সুন্দর করে দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত ধুলেন। তারপর তিনবার কুলি করলেন। নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করলেন। এরপর তিনবার চেহারা ধুলেন। দুই হাতের কনুই পর্যন্ত ভালোভাবে তিনবার ধুলেন। তারপর মাথা মাসেহ করলেন এবং টাখনু পর্যন্ত পা তিনবার ধৌত করলেন। এরপর বললেন, রাসুল ﷺ

বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি এভাবে (সুন্দর করে) অজু করবে, তারপর দুই রাকাত নামাজ আদায় করবে, যাতে (দুনিয়ার) কোনো খেয়াল করবে না, তার পেছনের সব (ছগিরা) গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।’ (বুখারি, ১৫৯; মুসলিম, ২২৬)

তাহিয়্যাতুল অজুতে জান্নাত লাভ

আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেন, ‘যে সুন্দর করে অজু করে এবং অজুর পর মনোযোগ দিয়ে দুই রাকাত নামাজ পড়ে; তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।’ (মুসলিম, ২৩৪)

তাহিয়্যাতুল অজুর নামাজে মর্যাদা বৃদ্ধি

তাহিয়্যাতুল অজুতে শুধু শুধু গুনাহই মাফ হয় না। বরং মান-মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়। একদিন ফজরের নামাজের সময় বেলাল رضي الله عنه-কে নবী ﷺ বললেন, ‘বেলাল! আমাকে বলো দেখি, ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর থেকে তোমার কোন্ আমলটি তোমার কাছে (সওয়াবের আশার দিক থেকে) সবচেয়ে উত্তম বলে মনে হয়? কারণ, আমি জান্নাতে আমার সামনে সামনে তোমার জুতার আওয়াজ শুনেছি।’

তখন বেলাল رضي الله عنه বললেন, ‘তেমন কোনো আমল আমার নেই; যার দ্বারা আমি (বিপুল সওয়াবের) আশা করতে পারি। তবে দিনরাতের যখনই আমি অজু করি; তখনই সেই অজুর মাধ্যমে যে কয় রাকাত সম্ভব হয়, আমি নামাজ আদায় করি।’ (বুখারি, ১১৪৯; মুসলিম, ২৪৫৮)

ফরজ ইবাদত পালনের পাশাপাশি নফল ইবাদতও করা চাই। তাই এই আমলেরও যত্ন নেওয়া উত্তম। আল্লাহ তাআলা গুনাহ মাফের পাশাপাশি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। আল্লাহর রাসুল ﷺ-এর সুন্নতও আদায় হবে।

১. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাহিয়্যাতুল অজু সংক্রান্ত হাদিস উল্লেখ্য করার পর বলেন, ‘এই হাদিসে অজুর পরপরই দুই রাকাআত নামাজ আদায় করা মুস্তাহাব হওয়ার দলিল রয়েছে।’

২. ইমাম নববি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ‘একাধিক বিশুদ্ধ হাদিস থাকায় প্রমাণিত হয়, অজুর পরপরই দুই রাকাত নামাজ পড়া মোস্তাহাব।’ (আল মাজমু শারহিল মুহাযযাব)

৩. শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, অজুর পরপরই দুই রাকাআত নামাজ পড়া মোস্তাহাব যদিও তা নিষিদ্ধ সময়ে হয়। শাফেয়ীগণও এমনটি বলেছেন।’ (আল ফাতাওয়া আল কুবরা)

৪. আল্লামা জাকারিয়া আল আনসারি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ‘যে ব্যক্তি অজু করবে তার জন্য অজুর পরপরই দুই রাকাআত নামাজ পড়া মোস্তাহাব; তা যে কোনও সময় হোক না কেন।’ (আসনাল মাতালিব)

৫. হজরত তানাজি শাফেঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ‘এই হাদিস থেকে অজু শেষ করার পর এবং দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান ও অমনোযোগী (অন্য কাজে ব্যস্ত) হওয়ার আগে অজুর দুই রাকাআত সুন্নাত নামাজ পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।’ (নেহায়তুয যায়ন)